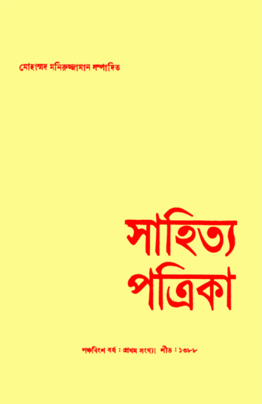

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের নায়ক-নায়িকা

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.5
Pages	65-86
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের নায়ক-নায়িকা

রফিকুল ইসলাম

আলোচ্য প্রবন্ধে তিন শ্রেণীর ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে, প্রথমতঃ নজরুল যাদের উদ্দেশে তার বিভিন্ন গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন, দ্বিতীয়তঃ যাদের উদ্দেশে কবিতা বা গান রচনা করেছেন, তৃতীয়তঃ নজরুল তার গল্প উপন্যাসে যে নায়ক-নায়িকাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং যাদের মাধ্যমে নজরুল নিজেকে কবিতা-উপন্যাস-গল্পে প্রতিফলিত করেছেন। বলা বাহুল্য যে ঐ তিন শ্রেণীর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে কেবল মাত্র গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারাই কল্পিত, অপর তিন শ্রেণীর নায়ক-নায়িকারা বাস্তব চরিত্র। উপরোক্ত নায়ক-নায়িকাদের পরিচয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নজরুল মানসের বিশেষ প্রবণতা ধরা যায়। নজরুল যাদের আদর্শায়িত বা মহিমান্বিত করেছেন সে সব বাস্তব বা কল্পিত মানুষের স্বরূপ থেকে নজরুলের আদর্শ এবং সংগ্রামের প্রকৃতিও উদঘাটিত হয়।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব সেই সব ভাগ্যবানদের কথা নজরুল যাদের উদ্দেশে তার গ্রন্থ উৎসর্গ করে নিজেই শুধু ধন্য হননি তাদেরও ধন্য করেছিলেন। নজরুলের সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য 'অগ্নি-বীণা' উৎসর্গ করা হয়েছিল প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র বা সন্ত্রাশবাদী বিপ্লববাদের অন্যতম উদ্গাতা 'ভাঙা-বাঙ্লার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রী শ্রীচরণার বিন্দেষু'কে, ঐ বিপ্লবীকে নজরুল বলেছিলেন, 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে;' বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে নজরুল যখন 'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেন তখন তিনি আর বিপ্লবী ছিলেন না, অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে সংগ্রাম থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন, উৎসর্গ কবিতায় প্রাক্তন বিপ্লবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সঙ্গে তাই অনুযোগও ছিল। 'অগ্নি-বীণার' উৎসর্গ কবিতা থেকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। অহিংসা অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিকায় সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি নজরুলের পক্ষপাতিত্ব তাৎপর্যপূর্ণ।

নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'বাঙ্লার অগ্নি নাগিনী মেয়ে মুস্লিম-মহিলাকুল-গৌরব আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা মিসেস এম্ রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে—'। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এই উৎসর্গের কারণ হলেও মিসেস এম্ রহমানের তেজস্বিনী চরিত্র যে ঐ গ্রন্থ উৎসর্গে নজরুলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। নজরুল তাকে 'নাগ-মাতা' সম্বোধনে তার জয় ঘোষণা করেছেন,

ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেতু-ধূম গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু-ফণী
উল্লাসে "জয় জয় নাগমাতা" হাঁকিল জয়-ধ্বনি!

নজরুল যে মিসেস এম রহমানকে শুধু মাতা নয় জগন্মাতার আসনে বসিয়েছিলেন তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় ঐ মহিলার মৃত্যুতে রচিত নজরুলের 'মিসেস্ এম্ রহমান'

কবিতায়। পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন মিসেস্ এম্ রহমান, নজরুলের কবিতায় সে সংগ্রামের পরিচয় ধরা পড়েছে,

সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রচীরের পানে চেয়ে!···
সে বলিত, "ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ঐ হেরেমের মোহে!
নারীদের ঐ বাঁদি ক'রে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে।···
বলে না কোরাণ, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাস, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস।
হাদিস কোরাণ ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক' তা'রা কোরাণের বাণী—সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম্ হয়ে রয় গুম্‌রাহ্ যত চোরে।"

নজরুল মিসেস এম রহমানকে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন, তার মৃত্যুতে শোক-গাথা রচনা করেছিলেন কারণ মিসেস এম্ রহমান নজরুলের ভাষায় 'দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের চুরি, মস্‌জিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইস্‌লামে হানা ছুরি!' বোঝা যায় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তনে মিসেস এম্ রহমানের বলিষ্ঠতাই নজরুলের শ্রদ্ধার কারণ।

নজরুলের আর একটি নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'ভাঙার গান' উৎসর্গ হয়েছিল 'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে,' নজরুলের কারামুক্তির পরে মেদিনীপুরবাসী নজরুলকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল, কিন্তু সেইটেই এ গ্রন্থ উৎসর্গের কারণ ছিল না। ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুর ছিল অগ্রণী। এক মেদিনীপুর জেলা থেকে যত যুবক ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন আর কোন জেলা থেকে তা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনে নজরুলের 'ভাঙার গান' উৎসর্গ হয়েছিল মেদিনীপুরবাসীর বিপ্লবী চেতনার উদ্দেশে।

নজরুলের 'চিত্তনামা' গ্রন্থটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। সংকলনের তিনটি গান ও দুটি কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে রচিত। দেশবন্ধু নজরুলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন তার হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রয়াসের জন্যে। নজরুলের সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চিত্তরঞ্জন দাস তা অপসারণের জন্যে অগ্রণী হয়ে 'হিন্দু-মুসলিম' বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পাদন করেছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে সে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, দেশ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। যে পটভূমিকায় নজরুলের বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' গানটি রচিত। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে নজরুল 'চিত্তনামা' গ্রন্থে সংকলিত 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় লিখেছিলেন,

পয়গাম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনি ক' মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ।···
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান্, দেখিনি ক' চোখে তাহে,
নাহি আফ্‌সোস্, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে।

নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনি ক' তাঁরে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা "রাজা-সন্ন্যাসী," প্রেমের জগৎ-শেঠ!

কবিতাটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, রক্ষণশীল মুসলমান পত্র-পত্রিকায় নজরুলকে 'কাফের', 'নমরুদ', 'ফেরাওন' কতোয়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার আতিশয্যই কেবল ঐ কবিতায় প্রকাশিত হয়নি আসল কারণও প্রতিফলিত হয়েছে,

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনিক' সন্দেহ
হিন্দু কিম্বা মুস্‌লিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!
জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ।

বলা বাহুল্য যে দেশবন্ধুর প্রয়াস, নজরুলের কামনা সফল হয়নি, ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফোটেনি এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাণ বরং কণ্টক হয়ে ফুটেছে।

নজরুলের 'ছায়ানট' উৎসর্গ হয়েছিল 'শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু, মুজফ্‌ফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদের করকমলে—।' নজরুল তার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সংগ্রামী বন্ধুদের উপহার দিয়েছিলেন প্রেমের কবিতা ও গানের সংকলন। নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে উপহার দিয়েছিলেন বেদনার কবিতা ও গান, যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন,

"এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা, এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালীতে, এই মোল্লা মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না ও যেন পোকায় কাটা ফুল পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানিনা। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারেনা, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফ্‌ফর দিনের পর দিন অর্ধাশনে অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে।···

মুজফ্‌ফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামী এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান প্রিজনার। বাংলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তারে হিমালয় পর্বতস্থিত আল্‌-মোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।···

যে মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল মুজফ্‌ফর অথচ তার নাম চিরকাল গোপন রেখে গেল।···

নজরুলের তার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পর্কে যা লিখেছেন মুজফ্‌ফর পরবর্তীকালে তার প্রতিদান দিয়েছেন নজরুল স্মৃতি চর্চার মাধ্যমে। নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসার চরিত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ছাপ পড়েছে। আনসার মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতোই বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সংগঠিত করতে গিয়ে বন্দী হন, যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন কিন্তু সেই ব্যাধিতেই তার জীবনের অবসান ঘটে।

নজরুল তাঁর 'সর্বহারা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন 'মা বিরজাসুন্দরী দেবীর শ্রীচরণারবিন্দে' দৌলতপুরে সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে বেদনা বিধুর নাটকের পরিসমাপ্তির পরে কুমিল্লায় ফিরে গেলে বিরজাসুন্দরী দেবী মায়ের স্নেহে নজরুলকে গ্রহণ করেছিলেন। নজরুল সে স্নেহ ও মায়া মমতার স্বীকৃতি রেখেছেন উৎসর্গ কবিতায়, 'সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার' সম্বোধনে বিরজাসুন্দরী দেবীর উদ্দেশে তিনি লিখেছেন,

দূর-দূরান্তর হ'তে আসে ছেলে-মেয়ে,
ভুলে' যায় খেলা তা'রা তব মুখে চেয়ে'
বলে, 'তুমি মা হবে আমার ?' ভেবে কী যে !
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায় !

স্নেহের কাঙাল কবির স্নেহের দান মা, বিরজাসুন্দরী দেবীর প্রতি 'সর্বহারা', যে মা নজরুলের দীর্ঘ অনশন ভাঙাতে সক্ষম হয়েছিলেন হুগলী জেলে।

নজরুলের 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তার গানের বন্ধু 'সুর-সুন্দর শ্রী নলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু' কে। বন্ধু, পরমাত্মীয় এবং দুঃখ-সুখের সাথী সম্বোধনে নজরুল তাকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এ উপহার বন্ধু বৎসল নজরুলের হৃদয়ের দান।

নজরুল তার 'সিন্ধু-হিন্দোল' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন হবীবুল্লাহ্ বাহার ও শামসুন নাহারকে, এটিতে ছিল চট্টগ্রামের স্মৃতিধন্য কবিতাবলী, চট্টগ্রামের বাহার ও নাহারকে স্নেহের দান।

কে তোমাদের ভালো !
'বাহার' আন গুল্‌শানে গুল্, 'নাহার' আন আলো।
'বাহার' এলে মাটীর রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

নজরুল তার প্রথম গীতি-সংকলন 'বুলবুল' দিয়েছিলেন তার সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে। নলিনীকান্ত সরকার, দিলীপ রায় ছিলেন নজরুলের গানের ভাণ্ডারী, নজরুলের গজল গান দিলীপ রায়ের কণ্ঠেই প্রথম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সে স্বীকৃতি 'বুলবুলের' উৎসর্গ কবিতায়,

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তার দিলে প্রাণ।···
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তা'রে সব বুকে, সবখানে।

দিলীপ রায় তার প্রথম ইউরোপ সফর থেকে দেশে ফিরে এলে তার সংবর্ধনা সভায় নজরুল তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে 'সুরের দুলাল' কবিতায় লিখেছিলেন,

পাকা ধানের গন্ধ বিধুর হেমন্তের এই দিন্-শেষে
সুরের দুলাল, আস্‌লে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বরবেশে।···
কখন আঁখির অগোচরে বসলে জুড়ে হৃদয় মন
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল লিখন।

নজরুল তার গানের ডালি 'চোখের চাতক' দিয়েছিলেন 'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু' কে। পূর্বাহ্নে প্রতিভা বা রাণু সোমের সঙ্গে ঢাকায় পরিচয়ের পরে নজরুল তাকে লিখে দিয়েছিলেন, 'মাটির ঊর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে স্বরগের যত পাখী, তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা তাদের কণ্ঠ রাখি'। নজরুল সেবারে ঢাকায় রাণু সোমের মতো উমা মৈত্র বা নোটনের সঙ্গেও সঙ্গীতের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েছিলেন, তবে নোটন রাণুর মতো কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন না তিনি সেতারী ছিলেন এবং ঢাকায় নজরুলের গানের সঙ্গে নিপুণভাবে সঙ্গত করতেন। নজরুলের 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল নোটনকে নয় তবে নোটনের বাবা 'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু' কে। কিন্তু 'চক্রবাকে'র দ্বিতীয় উৎসর্গ কবিতাটি মনে হয় নাম উল্লেখ ছাড়াই নোটনের উদ্দেশে,

উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক
উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি
হয়ত জাগিবে মনে শুনি' মোর গীতি!
শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হ'তে আন্-চরে, সেই গান গাই···
ভালোবেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে গান তোমারি পায়ে তাই দিনু দান!

এ গানের দান কি নোটনের জন্যেও নয় তা কি শুধু অধ্যক্ষ মহাশয়ের জন্যেই?

ঢাকায় নজরুলের ভাল লেগেছিল বিদূষি ফজিলতুন্নেসাকে, তাকে তিনি তার প্রথম কাব্য সংকলন 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, ফজিলতুন্নেসাকে নজরুল লিখেছিলেন,

> আপনি বাঙলার মুসলিম নারীদের রাণী। আপনার অসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে সামান্য কবির অপার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'সঞ্চিতা' আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে চাই।··· আমি ক্ষুদ্র কবি আমার জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি দিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীত আপনার প্রতিভার অন্য কি সম্মান করিব?

ফজিলতুন্নেসা কবির ঐ প্রার্থনায় সাড়া দেননি। 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করা হয়েছিল 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু'কে, এবং সেটাই যে নজরুলের কাব্য সংগ্রহের যথার্থ উৎসর্গ তাতে সন্দেহ নেই। তবে ফজিলতুন্নেসা নজরুলের জীবনের অন্যতম নায়িকা যার উদ্দেশে কবি 'রহস্যময়ী' বা 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' কবিতায় লিখেছিলেন,

তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক!—
সেদিন যে জ্বলেছিল দীপালি-আলোক
তোমার দেউল জুড়ি' ভুল তাহা ভুল!
সেদিন ফুটিয়াছিল ভুল করে ফুল
তোমার অঙ্গনে প্রিয়!…
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর
তোমার পরশ লভি' হইনু সুন্দর—
—তুমি তাহা জানিলেনা!

নজরুল পূর্বাহ্নে তার জীবনের এক পরম বেদনা-বিধুর অধ্যায়ের নায়িকা নার্গিসের পত্রের উত্তরে তাকে লিখেছিলেন,

> হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দু'টি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল, তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি।…মনে হয় যেন কাল্‌কার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল। সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিলনা।…

নার্গিসের উদ্দেশে 'হিংসাতুর' কবিতায় নজরুল লিখেছিলেন,

হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে? দেখ নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, 'চেয়ে' দেখিলেনা পিছু?…
মনে নাই তুমি চলেছ দু'পায়ে কবে কার ফুলহার?
কাঁদায়ে কাঁদায়ে সে রচেছে তাঁর অশ্রুর গড়খাই?

নজরুল অবশ্য কেবল তার বিরহের নায়িকাদের উদ্দেশেই কবিতা রচনা করেননি, জীবন-সঙ্গিনী প্রমীলার উদ্দেশে লিখেছিলেন 'বিজয়িনী' কবিতায়,

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
  বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,'
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।।

নজরুলের 'সন্ধ্যা' গ্রন্থটি উৎসর্গ হয়েছিল 'মাদারিপুর "শান্তি-সেনা"র কর-শতদলেও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে' আর নিষিদ্ধ 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থটি 'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে—', গানের সংকলন 'বন-গীতি' 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলা-বিদ্ আমার গানের ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে—' 'গুল-বাগিচা' অন্তরতম বন্ধু জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু আর 'গানের মালা' পরম স্নেহভাজন অনিল কুমার দাসকে। ঐ সব উৎসর্গ নজরুলের শ্রদ্ধার ও স্নেহের উপহার। যেমন তার অনুবাদ কর্ম 'কাব্য আমপারা' তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'বাঙ্‌লার নায়েবে-নবী মৌলবী সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'। নজরুলের অনুবাদ কাব্য 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' ছিল ব্যথার দান, কবির নয়ন-মণি চার বছরের ছেলে বুলবুলের স্মৃতির উদ্দেশে নজরুল লিখেছিলেন,

বাবা বুলবুল! তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি-আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ!···জানি না তুমি কোথায়। যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ করো।

নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থ যাদের উৎসর্গ করা হয়েছিল নজরুল তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি ভালোবাসা, অনুরাগের বিচিত্র সম্পর্কে, আনন্দ ও বেদনায়, সুখ ও দুঃখে নজরুল যে সব মানুষের সঙ্গে জীবন যাপন করেছেন তাদের উদ্দেশে তিনি তার সৃষ্টির সম্ভার নিবেদন করেছেন। এর থেকে শুধু কবি, গীতিকার বা কর্মী নজরুলের চেয়েও মানুষ নজরুল ও তার অন্তরঙ্গ ভুবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক অর্থে ঐ মানুষেরাই নজরুলের জীবনের নায়ক-নায়িকা আবার ঐ সব মানুষের নায়ক নজরুল। তাই রবীন্দ্রনাথ তার গীতি নাটিকা 'বসন্ত' উৎসর্গ করেন তাকে। তার ঐ সব নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে ছিলেন বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকের বাংলাদেশের কয়েকজন প্রকৃত বিপ্লবী, রাজনীতিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ আর ছিলেন কিছু উদার প্রাণ খাঁটি মানুষ।

প্রাসঙ্গিক দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস এবং সমকালের বেশ কিছু মানুষের উদ্দেশে নজরুল শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবিতায়, বিশেষ করে সেই সব ব্যক্তিত্ব তার উপজীব্য হয়েছে যারা নিজেরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের কামাল পাশা ও আনোয়ার নিয়ে রচিত দুটি কবিতা নজরুলের এ ধারার সৃষ্টির শুরু। নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশা নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল খুবই, কারণ কামাল আতাতুর্কই প্রথম সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়ক যিনি একটি মুসলমান দেশে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় শাসন উচ্ছেদ করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে পেরেছিলেন, যিনি গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয় কারণ তুরস্ককে রক্ষণশীল, ধর্মান্ধ গোড়া মোল্লাতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করে সেখানে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। তাই নজরুলের কাছে কামাল মহাবীর এবং পাগলী মায়ের দামাল ছেলে,

ঐ শুনেছিস? ঝরকাতে সব বল্‌ছে ডেকে বৌ-দলে--
"কে বীর তুমি? কে চলেছে চৌদোলে?
চিনিস্‌নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব?--কামাল এ যে কামাল।
পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!
তা না হ'লে কা'র হবে আর রৌশন্ এমন জামাল?

অসুর পুরে যে কামাল শোর তুলেছিল তার প্রশংসায় নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, 'কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই।' স্বদেশে নজরুলই ছিলেন আমাদের কামাল, অসুরপুরে নজরুলের মত অমন স্বর অমন শোর আর কেউ তো তুলতে পারেনি। 'আনোয়ার পাশা'কে নজরুল তার কবিতায় প্রায় কামালের সমকক্ষ বিবেচনা করেছিলেন কিন্তু ইতিহাস বলে আনোয়ারের তা প্রাপ্য নয় কারণ কামাল তুর্কী সালতানাত বা সাম্রাজ্য গড়তে চাননি, কিন্তু আনোয়ার মধ্য এশিয়ায় ইংরেজের সহায়তায় তেমনি এক রাজ্য গড়তে চেয়েছিলেন অবশ্য এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আনোয়ার পাশাও প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে মধ্য এশিয়ার এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর সে কারণে তার চরিত্র নজরুলকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে নজরুলের প্রকৃত নায়ক ছিলেন গাজী মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

'বিষের বাঁশী' কাব্যের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্', আবির্ভাব ও তিরোভাব কবিতায় নজরুল হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আবির্ভাব কবিতার শুরুতে মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধরাধামে যে আনন্দময় চিত্র অংকন করা হয়েছে তা ইসলামের উন্মেষ যুগের উন্মাদনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়,

নাই তা-জ
তাই লা-জ
ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!
ক'রে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝা!
উর্‌জ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেজাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
মেসের ওমান্ তিহারান্—স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

'আবির্ভাব' কবিতাটির শেষে প্রশংসিত মানবের উদ্দেশে কবির শ্রদ্ধা উচ্চারিত হয়েছে নিম্নরূপে,

ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে, ভাসে কালাম
"এয় শাম্‌সুজ্জোহা বদরুদ্দোজা কামারোজ্জামাঁ সালাম!"

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে নজরুলের প্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন তার আরো পরিচয় পাওয়া যায় রসুলুল্লাকে নিয়ে রচিত অসংখ্য 'নাত' এবং 'মরুভাস্কর' কাব্য থেকে। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নজরুল দেখেছেন মানব জাতির একজন মুক্তি-দাতা হিসেবে, 'মরু-ভাস্কর' কাব্যের 'অনাগত' অংশে তারই পরিচয়,

উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়,
বন্ধ—ছেদন নবী কোথায়!
নিপীড়িতের মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়!

স্পষ্টতঃ বোঝা যায় নজরুল রসুলুল্লাহকে দেখেছেন শৃঙ্খলিত চির-দাস নিপীড়িতের মুক্তিদাতা এবং শাস্ত্র-আচার-জগদল-শিলা তলে বন্দী প্রাণের বিদ্রোহী রূপে। যে আদর্শ নজরুলের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। হজরত মোহাম্মদের ধরায় আগমন ক্ষণ বর্ণনায় তাই কবির উল্লাস,

"মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবী।"
গাহিতে নান্দি গো যাঁর নিঃস্ব হ'ল বিশ্ব-কবি।
আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল অন্ধ গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।

সুতরাং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) নজরুলের দৃষ্টিতে 'বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব। 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে নজরুল 'সর্বহারা' এবং 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ' এর রূপই শুধু অংকন করেননি, অসমাপ্ত কাব্যটির শেষ অংশ হল 'সাম্যবাদী'। দুর্ভাগ্যক্রমে 'সাম্যবাদী মোহাম্মদ' এর পরিচয় নজরুল শেষ করতে পারেননি।

ইসলামের গৌরব যুগের ইতিহাসের দু'জন নায়ককে নজরুল তার কবিতায় মহিমান্বিত করেছেন, একজন খলিফা উমর ফারুক, অপরজন বীর সেনাপতি খালেদ। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক এর নির্দেশক্রমে আজানের প্রচলন হয়, তিমির রাত্রিতে এশার আজান শুনে উমরকে স্মরণ করেন কবি, তাকে আহ্বান করেন স্বধর্মীদের বর্তমান অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের জন্যে,

উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহ্বান নয়-রূপ ধরে এস! —গ্রাসে অন্ধতা-রাহু...
'ফির্দৌস ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শম্সের ধরি,'
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদেরে পুনর্বার,
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি' হাতিয়ার!
দেখাইয়া দাও—মৃত্যু যথায় রাঙা দুল্‌হিন—সাজে
করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ—ভূমি মাঝে!...
সেনানী! চাই হুকুম!...
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ!
মোরা "আস্‌হাব-কাহাফের" মতো দিবানিশি দিই ঘুম,
"এশা"র আজান কেঁদে যায় শুধু—নিঃঝুম নিঃঝুম!

অতীত গৌরব থেকে প্রেরণা নিয়ে বর্তমানকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস নজরুলে পুনঃ পুনঃ লক্ষণীয়। খলিফা উমরের বীর সেনাপতিকে নিয়ে রচিত 'খালেদ' কবিতাতেও একই আবেগ কাজ করেছে, নজরুল উমরের মতো খালেদকেও আহ্বান জানিয়েছেন পুনরাবির্ভাবের জন্যে,

খালেদ! খালেদ! ফজর হ'ল যে, আজান দিতেছে কৌম্‌,
ঐ শোন শোন—"আস্‌সালাতু খয়্‌র্ মিনান্নৌম্‌!"
যত সে জালিম রাজা—বাদশারে মাটিতে করেছ গুম্‌
তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম্‌
বাহিরিয়া এস, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি!...
খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!
তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা!
হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্তানে,
মগ্‌রেব বাদে এশার নামাজ পাব কিনা কে সে জানে!
খালেদ! খালেদ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাতিয়ার—হারা দাঁড়ায়েছি তাই তহ্‌রিমা বেঁধে এসে!

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মুসলীম জগতে 'সফেদ দেও' বা শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীদের যে বিভীষিকার উল্লেখ করা হয়েছে তা হল এশিয়া ও আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির শাসন

ও শোষণ। 'সফেদ দেও' এর 'জগৎ জুড়িয়া বিভীষিকা'র হাত থেকে মুক্তির জন্য নজরুল বীর খালেদের শৌর্য-বীর্যের আবাহন করেছেন, তা ছাড়া বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে যে সব জাতীয়তাবাদী নেতা সংগ্রাম করেছেন নজরুলের কবিতায় তারাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ইংরেজ পদানত মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কের মৃত্যুতে নজরুল রচনা করেছেন 'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতা, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন,

পয়গাম্বর ছিলে না ক'তুমি—পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিলনা দোসর, ছিলেনা শাস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরি-পর্বত।
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব, থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান।
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তা'রা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে—দেশজয় নাহি হয়।

আধুনিক আফগানিস্তানের স্থপতি 'আমানুল্লাহ' কে নজরুল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি কাবুলের আমির ছিলেন বলে নয় বরং মধ্যযুগীয় আফগান সমাজে আধুনিক ভাবধারা সঞ্চারের জন্যে। ভারত সফরে এলে তাকে স্বাগতম জানাতে গিয়ে নজরুল লিখেছিলেন,

খোশ আম্‌দেদ আফ্‌গান—শের। অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা শাহান্‌শাহ্।
নাই সে ভারত মানুষের দেশ। এ শুধু পশুর কতল্-গাহ্।…
'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহিনা গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান।
ঐ বাদশাহী তখ্‌তের নীচে দীন্-ই-ইস্‌লাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু ক'রে আজো কাঁদে আর মুখ লুকায়।

স্পেন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার বীর মুক্তি-যোদ্ধা রীফ্-সর্দার ইবনে করিম কে নজরুল শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাকে তিনি বলেছেন নবযুগের নেপোলিয়ন্। রীফ্-সর্দার সম্মুখ রণে পরাজিত হননি, তিনি কৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের শিকার হয়ে বন্দী হয়ে ছিলেন। শত্রু তাকে জয় করতে পারেনি, ঐ বীর যোদ্ধা সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় কপট ছল চাতুরীর কাছে বন্দী হয়েছিলেন, নজরুল তাই পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন,

সম্মুখে রাখি' মায়া-মৃগ
পশ্চাৎ হ'তে হানে শায়ক—
বীর নহে তা'রা ঘৃণ্য বাধ
বর্বর তারা নর—ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার।
কেশরীর সাথে হয়নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।...

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে যে ভারতীয় মুসলমান নেতাকে নজরুল শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তিনি হলেন মওলানা মোহাম্মদ আলী। মওলানা সাহেবকে নজরুল কামাল, জগলুল প্রমুখ মুসলীম জাহানের প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুতে তিনি লিখেছিলেন,

আধেক হিলাল ছিল আস্‌মানে, আধেক হিলাল দুনিয়ায়
দুনিয়ার চাঁদ গেল আস্‌মানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে ইরানে তুরানে ইরাকে মেসেরে সিরিয়ায়,
হিন্দুস্থানে ছিল সে রতন, হারাইয়া গেল সে-ও, হায়!
উহাদের ছিল ইব্‌নে-করিম, সউদ, কামাল, জগ্‌লুল;
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলী—একাই সবার সমতুল।...
ছিল আওরঙ-জেবী-দ্বীনি জোশ্, আক্‌বরী-দিল-মিলনের,
ছিল কমরেড, ছিল হামদর্দ, দীন দরিদ্র সকলের।
'মোহম্মদের' ইসলাম-প্রীতি, 'আলী'র শৌর্য বাহুবল
ছিল গো যাহাতে আজি অসময়ে সেই ছেড়ে গেল ধরাতল!

বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নজরুল কেবল মাত্র শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। নজরুল তার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম ও শেষ পর্বে শেরে বাংলার 'নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'নবযুগ' শেষপর্বে ছিল পাকিস্তান বিরোধী জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুখপত্র, হক সাহেব তখন বাঙালী মুসলমান সমাজে অপাংক্তেও, নজরুলের 'নবযুগ' কবিতায় সেই দুঃসময়ে হক সাহেবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অসুস্থতার প্রাক্কালে লিখেছিলেন,

সে যুগের ওগো জগ্‌লুল্! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ,
স্মরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ।...
আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
এক আল্লাহ্ জানেন তোমারে, দিয়াছ কি কোরবাণী!
এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদের কর ক্ষমা,
আবার এদের ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা।

নজরুল ইসলাম যে সব মহামানব, মহাপুরুষ, মহাবীর, এবং মহান নেতাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন সে তালিকা পর্যালোচনা করলে নজরুল মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ), খলিফা হজরত ওমর ফারুক, বীর সেনাপতি খালেদ, মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, আনোয়ার পাশা, জামালউদ্দীন আল্ আফগানী, জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ্, রীফ্ সর্দার ইবনে করীম, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক অর্থাৎ ইসলামের উন্মেষ যুগ থেকে শুরু করে, খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ বা গৌরবময় যুগ, মধ্যপ্রাচ্যের মরক্কো, মিশর, তুরস্ক থেকে আফগানিস্তান, ভারত তথা বাংলাদেশের মুসলমানদের উত্থান, পতন, অবক্ষয়ের যুগ এবং জাগরণের জন্যে সংগ্রাম ধরা পড়েছে নজরুলের বন্দনায়।

নজরুল যে সব বাঙালী সাহিত্যিকদের নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় নজরুলের যথার্থ পূর্বসূরী, সত্যেনদত্তের 'সাম্যসাম' নজরুলের 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কবিতা সমষ্টির, সত্যেন দত্তের 'কুস্থানাদপি' নজরুলের 'বারাঙ্গনা' আর তার 'দেবতার স্থান' নজরুলের 'মানুষ' কবিতার পূর্বসূরী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে নজরুল একাধিক কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন, সত্যেনদত্তের প্রতি নজরুলের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বর্ণিত 'সত্য-কবি' কবিতায়,

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম—অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব, ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নি ক' কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই।...

নজরুল ঐ কবিতায় সত্যেনদত্তের যে গুণের কথা বলেছেন পক্ষান্তরে তা নজরুলেরই বৈশিষ্ট্য, সত্যেনদত্তের কবিতার সঙ্গে নজরুলের কবিতার এক ধরণের সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষতঃ উপাদান ও শিল্প প্রকরণে আর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী কবির সম্পর্ক ছিল স্নেহ, প্রীতি আর শ্রদ্ধার। সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় তারই পরিচয় পাই।

বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র নজরুলকে খুবই স্নেহ করতেন, 'ধূমকেতু' প্রকাশে নজরুলকে তিনি অভিনন্দন বাণী পাঠিয়ে ছিলেন, রাজবন্দী নজরুলের অনশন ভঙ্গ করানোর জন্যে শরৎচন্দ্র হুগলীর জেল গেটে গিয়েছিলেন। তাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নজরুল 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় তাকে বলেছেন 'নব ঋত্বিক নবযুগের।' যে শরৎচন্দ্র নজরুলের ভাষায়,

শুনাইলে বাণী, "নহে মানব—
গাহি গো গান মানবতার।
মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় গো লয়, রয়, গোপন,
প্রেমের যাদু স্পর্শে সে
লভে অমর নব জীবন।"

শরৎচন্দ্রকে নজরুলের শ্রদ্ধার কারণ এ কবিতায় বর্ণিত, যার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত,

দেখিছ কঠোর বর্তমান,
নয় তোমার ভাব-বিলাস,
তুমি মানুষের বেদনা-যায়
পাওনি গো ফুল-সুবাস।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
নব ধরার জীবন-বেদ,
করনি মানুষে অবিশ্বাস
দেখিয়া পাপ পঙ্কু ক্লেদ।...

সত্যেন দত্তের মতো শরৎচন্দ্রেরও যে সব গুণাগুণের উল্লেখ নজরুলের কবিতায় রয়েছে তার অনেকগুলি নজরুল সাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে শরৎ-

চন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের মধ্যে একটি মিল ছিল যা তাদের সম্পর্ককেও করেছিল প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলার দুই প্রধান কবির ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক সম্পর্ক ছিল বিচিত্র এবং আকর্ষণীয়, নজরুল তার সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকেই পেয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, রাজবন্দী নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তার গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ করে সম্মানিত করেছিলেন, অনশনব্রতী নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের দুয়ার নজরুলের জন্যে ছিল অবারিত। রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' কবিতার উত্তরে নজরুল ও লিখেছিলেন '১৪০০ সাল' কবিতা। 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' সম্পর্কিত সাহিত্যিক বিতর্ক এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ ও 'শনিবারের চিঠি' স্বষ্ট সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্ক ছিল বিশ ও ত্রিশের দশকে বরাবর সৌহার্দ্যের, স্নেহ ও শ্রদ্ধার। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উত্তরে, নজরুল 'তীর্থপথিক' কবিতায় আবেগ ভরে লিখেছিলেন,

তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্বষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
কাব্যলোকের বাণী-বিতানের আমি কেহ নাহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কেন এ আশিশ হার ?
প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে।

ঐ কবিতা রচনার ঠিক ছয় বছর পর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল একাধিক গান ও কবিতা রচনা করেন, যেগুলো তখন কলকাতা বেতার থেকে প্রচারিত হয়। নজরুলের ঐ সব রচনার মধ্যে 'রবি-হারা' কবিতাটি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ কারণ এ কবিতায় রবীন্দ্র-প্রয়াণে নজরুলের ব্যক্তিগত নয় বরং বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির যে ক্ষতি ও শোক বিশেষ করে তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছিল,

দুপুরের রবি পড়িয়াছে চ'লে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে' এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে।
বিশ্বের রবি, ভারতের কবি,
শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চ'লে যাবে বলে।...
শুনেছি, সূর্য নিভে' গেলে হয় সৌরলোকের লয় ;
বাঙলার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।
বাঙালী ছাড়া কি হারালো বাঙালী কেহ বুঝিবে না আর,
বাঙলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবেনা হাহাকার।

ঐ কবিতার মধ্য দিয়ে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্র-প্রয়াণে নজরুলের কণ্ঠে অবিভক্ত বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির শোক ও বেদনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল, আর বিস্ময় লাগে যে তার ঠিক একটি বছর পরে ১৯৪২ সালের

জুলাই/আগষ্ট মাসে নজরুলের কণ্ঠও নীরব হয়ে যায়। নিয়তির নিষ্ঠুর লীলায় চল্লিশ দশকের শুরুতে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির সর্বকালের দুটি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ চিরতরে নীরব হয়ে গেল।

আলোচনার তৃতীয় বা শেষ পর্বে আমরা নজরুলের গল্প এবং উপন্যাসের চরিত্রসমূহ থেকে নজরুল সৃষ্ট কয়েকজন নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মধ্যে নজরুলের প্রতিফলন লক্ষ্য করব। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'ব্যথার দান' গল্পের দারা এবং সয়ফুল মুলুক বেলুচিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে তুর্কিস্তান, ককেশাসে গিয়ে 'লালফৌজে' যোগদান করে এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশের জন্যে করাচী থেকে প্রেরিত এই গল্পে 'লালফৌজ' এর নিম্নরূপ উল্লেখ ছিল,

> ...ঘুরতে ঘুরতে এই লালফৌজে যোগ দিলুম। এই পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে তারা খুব উৎফুল্ল হয়েছে। মনে করছে, এদের এই মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর চোখ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সংঘের একজন।....

রুশ দেশে বলশেভিক বিপ্লবের পর পর নজরুল তার গল্পের নায়কদের যে মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করে 'লালফৌজে' যোগদান করিয়েছেন এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা যোগ দিয়েছে, এইটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে নজরুলের পূর্বে কেউ করেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই।

নজরুলের কয়েকটি গল্পের নায়কই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন যেমন 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন'-এবং 'ঘুমের ঘোরে' গল্পের নায়ক পল্টনে যোগ দিয়ে ছিল। উল্লিখিত তিনটি গল্পের নায়ক চরিত্রেই সৈনিক নজরুলের অভিজ্ঞতা ছায়াপাত করেছে, গল্পগুলোর প্রেক্ষাপট বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ককেশাশ, কুতল্ আমারা, করাচী, সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান। নজরুলের দুটি গল্পের নায়িকা বাঙালী কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী, 'রাক্ষুসী' গল্পের বিন্দি, যে তার স্বামীকে পরকীয়া প্রেমের কারণে নরকের পথ থেকে রক্ষার জন্যে হত্যা করে আর 'পদ্ম-গোখরো' গল্পের জোহরা, যে তার মাতৃত্বের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল সর্প-সন্তান দিয়ে। নজরুলের যে সব গল্পের পটভূমিকা বাংলাদেশের বাইরে ঐ সব গল্পের নায়কেরা যুদ্ধের এবং প্রেমের নেশায় বুঁদ, নায়িকারা বন্য বা মরুচারী। 'রিক্তের বেদন' এর গুল বেদুইন কন্যা। গুল মারা যায় নায়কের গুলীতে। মেহের নেগার গল্পের নায়িকা গুলশান এক বাইজীর কন্যা, অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও পবিত্র ভালবাসা তার বুকে পরশ দিয়েছিল, 'ব্যথার দান', এর নায়িকা বেদৌরা মুহূর্তের ভুলে দেহের পবিত্রতা নষ্ট করেছিল তাই নায়ক যুদ্ধে গিয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে ছিল। নজরুলের গল্পের নায়িকারা কিন্তু সবাই প্রেমে একনিষ্ঠ এবং মোটামুটিভাবে পরিণতি তাদের বিষাদান্ত।

নজরুলের তিনটি উপন্যাসের প্রথমটি 'বাঁধন-হারা', পত্রের আকারে রচিত বলে সমালোচকেরা এর নাম দেন পত্রোপন্যাস। এ উপন্যাসের নায়ক নুরু করাচী সেনানিবাস থেকে দেশে বন্ধু ও আপনজনদের যে সব পত্র দিয়েছে তাতে নজরুলের সৈনিক জীবনের ছাপ পড়েছে। নজরুলের পল্টনে যোগ দেবার কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় 'বাঁধন-হারা'তে,

…যে সামরিক শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য বাঙালী এই প্রথম লাভ করেচে, তাকে এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত ? আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে করাচী থেকে মেসোপটেমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় সৈনিক নজরুলের মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল তা ধরা পড়েছে,

আমাদের "মোবিলিজেশন অর্ডার" বা যুদ্ধ সজ্জার হুকুম হয়েছে। তাই চারিদিকে "সাজ সাজ" রব প'ড়ে গেছে। খুব শীঘ্রই আরব্-সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর ধরচে না।…

কিন্তু সৈনিকের আশা পূরণ হয়নি, মেসোপটেমিয়ায় তার যাওয়া হয়নি, আশা ভঙ্গের ক্ষোভ তাই রূপান্তরিত হয়েছিল ক্রোধে, 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়ক সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিন রক্ষা করতে পারেনি,

তিনি কিছু দিন থেকে নাকি আমার প্যারেড ও কাজে অসাধারণ চটক, নৈপুণ্য এবং কর্তব্যপরায়ণতা দেখে আসছিলেন,…তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাদের কোম্পা-নীর সুবাদার সাহেবকে ব'ললেন যে, আমার মেসোপটেমিয়া যাওয়া হবে না, নতুন রংরুটদের শিক্ষা দেবার জন্যে করাচীতেই থাকতে হবে এবং আমাকে ঐ খেসা-রতের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লান্স্-নায়কের পদে উন্নীত করা হবে।…তাই তাঁর… প্রতিবাদ করায় তিনি বেদম খাপ্পা হ'য়ে চোখ রাঙিয়ে উঠলেন,—"মেরা হুকুম হেয়।" তোর হুকুমের নিকুচি করি। …তাই যেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চোস্ত্ গোছের পরিপক্ক একটি ঘুষি সাহেবের বাম চোয়ালে,…তারপর আমায় ঠেলে ঢোকানো হ'ল 'কোয়ার্টার গার্ডে' বা সামরিক হাজতে; তারপর বিচারে ২৮ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ও গারদখানায় বাস।…

মেসোপটেমিয়ায় যেতে না পারায় সৈনিক নজরুলের ক্ষোভের পরিচয় ঐ উপাখ্যানে পাওয়া যায়, ঘটনাটা সত্য হোক বা না হোক। আসলে সৈনিক জীবনে কবি সৈনিকের প্রশিক্ষণ হচ্ছিল মেসোপটেমিয়া যাবার জন্যে নয় বরং ভবিষ্যতের সংগ্রামী জীবনের জন্যে। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে নজরুল সে কথা বলেছেন,

আগুন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, আঘাত, বেদনা—এই অষ্টধাতু দিয়ে আমার জীবন তৈরী হ'চ্ছে, যা হ'বে দুর্ভেদ্য—মৃত্যুঞ্জয়—অবিনাশী।—আমার এ পথ শাশ্বত সত্যের পথ,—বিশ্বমানবের জনম জনম ধরে, চাওয়া পথ।

বিশ্ব মানবতা ও শাশ্বত সত্যের পথে ঐ সৈনিকের সংগ্রামের পরিচয় আমরা নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মৃত্যু-ক্ষুধা' এবং তৃতীয় উপন্যাস 'কুহেলিকা'তে পাই। 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র নায়ক আনসার সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করার জন্যে কৃষ্ণনগরে আসে তার বর্ণনা অনেকটা কৃষ্ণনগর-বাসী বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী নজরুলের মতোই,

যুবকের গায়ে খেলাফতী ভলাণ্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরের জামা-কাপড়—কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা ব'লে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মত টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে

পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিক-দের ইউনিফর্মের মত কোট-প্যাণ্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া বিরাট বুট, চ'ড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ।···

ঐ যুবক অর্থাৎ আনসারের গায়ে বিচিত্র খেলাফতী ভলাণ্টিয়ারের পোশাক থাকলেও সে কিন্তু খেলাফত আন্দোলনের জন্যে কৃষ্ণনগরে আসেনি, এখানে এসেছিল সে সমাজের মেহনতি মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে সংগঠিত করতে,

এই দু-তিন দিন আনসার গরু গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, রাজ মিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে রীতিমতো হুলুস্থূল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষেপাতে।···ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকি কংগ্রেস-ওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে।

আনসারের এই বলশেভিকী কার্যকলাপের ফল ফলতেও বিলম্ব হয়নি. আনসার বন্দী হল. প্রতিক্রিয়াও তাৎক্ষণিক,

আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনও বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার-গুঁতো-চাবুক-লাথিতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেললে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু-একটা ফাঁকা আওয়াজও করলে বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। বাইরে জন-সংঘ ক্রন্দন কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল! ও যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুঙ্কার!

ঐ জনতাকে পুলিশ হঠাতে পারেনি, জনতা ঐ স্থান পরিত্যাগ করেছিল কেবল মাত্র আনসারেরই অনুরোধে। আর আনসার যাবার সময় তাদের বলে গিয়েছিল,

বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা তোমা-দের অধিকারের দাবী কিছুতেই ছেড়ো না! তোমাদেরও হয়ত আমার মত ক'রেই শিকল প'রে জেলে যেতে হবে, গুলী খেয়ে মরতে হবে, তোমারই দেশের লোক তোমার পথ আগ্‌লে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হ'য়োনা। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি।···

আনসারের স্থান হয়েছিল রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলে কিন্তু কম্‌রেড মুজফ্‌ফর আহমদের মতো তার বুক পোকায় খেয়ে ফেলেছিল তাই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে ইংরেজ শাসক তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওয়েলটারের সমুদ্র সৈকতে। আনসার তার বোনকে রেঙ্গুন কারাগার থেকে লিখেছিল,

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিস্‌নে। ভাই আমরা ত ফেরারী আসামী হ'য়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই পথের পথিক যারা র'য়ে গেল—তাদের মাঝেই আমায়

দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসিমঞ্চে আমরাও আজই এসে দাঁড়াইনি,…জীবনকে আমরা জীবিতের মতই ব্যয় ক'রে গেলাম, মৃতের মত কার্পণ্য ক'রে কাক-শকুনের খাদ্য করিনি।

'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে নায়িকা দু'জন বিধবা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে মেজ-বৌ আর উচচ শ্রেণীর রুবি। মেজ-বৌ বিধবা কিন্তু সুন্দরী, যার শাশুড়ী সর্বদা উদ্বিগ্ন মেজ-বৌ আবার নিকে করে কিনা। মেজ-বৌ খুশী হলে গান করে অস্ফুট স্বরে,

শাশুড়ী ক্ষুণ্ন হয়ে বলে, "মা, তুই ঐ গান ছেড়ে দে দিকিন্! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা' হয়, শুনিস্‌নি সেদিন মৌলবি সায়েবের কাছ্ থেকে?"… মেজ-বৌ হেসে বলে, "কিন্তু আমি যে ওতে খুশী হই মা? আমি খুশী হ'লে কি তিনি খুশী হননা? আচ্ছা মা, তুমি—মৌলবী সায়েবকে জিজ্ঞাস করো ত, গান ক'রে তাকে ডাকলে, তাঁর কাছে কাঁদলে কি তিনি তা শোনেন না?

এ হেন যে মেজ-বৌ, সে লেখা-পড়া শেখার জন্যে খৃষ্টান মিশনারী মিস্ জোন্‌সের কাছে যাওয়া'র ফলে সমাজে রি রি পড়ে গিয়েছিল, 'পাড়ার পুরুষ মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগীরা মেজ-বৌকে "আড়কাঠি' ক'রে সব বৌ-ঝিকে 'খেরেস্তান' করে তুলবে।' এর বিহিত করার জন্যে যথারীতি ব্যবস্থাও হয়েছিল,

পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের (মেজ-বৌর দেবর) বাড়ী মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ঈমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ী সরগরম হ'য়ে উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই মওলানা হজরত পীর গজনফর্ সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা (মেজ-বৌর শাশুড়ী) আপাতত তার বাড়ীর ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনর টাকা যোগাড় ক'রে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।

সমস্ত ব্যাপারটা আনসারের ভাষায় "ঘোড়ার ডিম! মেজ-বৌ হ'ল খ্রীষ্টান লাভ হল পীর আর মওলানা সাহেবদের।…প্যাঁকালের মা (মেজ-বৌর শাশুড়ী) এত কেঁদে বেড়িয়েছে আজ, কিন্তু আজ মৌলুদ শরীফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে। …ঐ ছাগল ক'টাইত ওর সম্বল—তাই তাকে কাল বিক্রি করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

এ অবস্থায় যে আনসার যে জানে শুধু কার্ল মার্কস্, লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্টালিন, কৃষক, শ্রমিক, পরাধীনতা, অর্থনীতি। তার মনেও পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ ছাড়াও যে অন্যরকম মরবেদনাবোধ থাকতে পারে—এ প্রশ্ন জেগেছে এই সেদিন। নারীকে যে অশ্রদ্ধাও করেনা, নারীর প্রতি যার কোন আকর্ষণও নেই। নারী সম্বন্ধে যে উদাসীন মাত্র। সেই আনসার মেজ-বৌর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করল,

"আচ্ছা বলুন ত, আপনার হঠাৎ খ্রীষ্টান হবার কারণ কি?'

মেজ-বৌ উত্তর দিয়েছিল, 'আমি ত হঠাৎ খ্রীষ্টান হইনি' আনসার যখন তাকে বলল, তার [illegible] আপনি একটু একটু করে খ্রীস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি? মেজ-বৌ বলেছিল, "জিনা। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীষ্টান করেছেন।"

আনসার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে এই নারীর দিকে চেয়ে সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলেছিল, 'বুঝেছি আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশী অত্যাচার ক'রে আপনার মত মেয়েকেও খ্রীস্টান হতে বাধ্য করেছে।' মেজ-বৌ যখন জানতে চেয়েছিল কোনদিন ইচ্ছে হলে সে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে কিনা, আনসার তাকে বলেছিল, "নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছে দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোন ভয় নেই। আপনার এই ধর্ম-পরিবর্তনে আমি অন্তত এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার মত মেয়েকে যোগ্য স্থান দেবার মত জায়গা আমাদের এই অবরোধ ঘেরা সমাজে নেই।"

'মৃত্যু-ক্ষুধা'র অপর নায়িকা রুবি ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, যে ভালোবাসে আনসারকে অথচ পিতা মাতার ইচ্ছায় যার বিয়ে হয়েছিল এক আম্‌লার সাথে। কিন্তু রুবী স্বামীকে ভালোবাসেনি, সে তার ভালবাসা চায়নি, রুবিও চায়নি, সে চেয়েছিল রুবিকে বিয়ে করে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ-খরচা, তা সে পেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর দিন-কয়েক আগে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। তার মৃত্যু কিন্তু রুবির কাছে আত্মীয়-বিয়োগের মত পীড়াদায়ক মনে হয়নি। সেই রুবি যখন জানল আনসার যক্ষ্মায় আক্রান্ত এবং সেই কারণে কারামুক্ত হয়ে ওয়াল্‌টেয়ারে তখনই সে বেরিয়ে পড়েছিল তার উদ্দেশে সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী আনসারকে শুধু সেবা নয় তার কাছে নিজেকেও সমর্পণ করেছিল, আনসারের বোনকে লেখা রুবির চিঠিতে সে কাহিনী,

> ...আমি অমনি ঘরে ঢুকে বললাম, "আমি এসেছি।" সে কী আনন্দ তার চোখে-মুখে সে 'রুবি' বলে ডেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।...
> তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখেছিস? ...দু'দিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি বণ-হরিণীর? সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয়—ওর জন্য। এ সর্বগ্রাসী ক্ষুধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয়—এ যে ওরও মৃত্যু! ও যে মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস ক'রে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ আর ওর আছে? সে যখন বলল, 'রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড় হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন কর! আমি মৃত্যুঞ্জয় হই। আমি আমার উপবাসী ভিখারী বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না! আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না, দু'দিন আগে মরবে এই ত! তা ছাড়া এ মৃত্যু ত ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-জীবাণু আমাকেও ত আক্রমণ ক'রবে!
>
> সে কি তৃপ্তি, সে কি আনন্দ ওর! মরুপথের পথিক মরবার আগে যেন মরুদ্যানে ছায়া পেল!

বিশের দশকে রচিত 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুল আনসার, মেজ-বৌ আর রুবি ঐ তিনটি চরিত্র বা নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে দেশ-কাল-সমাজ-ধর্ম আর মানুষের যে ছবি এঁকেছেন তাতে প্রতীয়মান হয় সমকালীন ধ্যান-ধারণা থেকে কত অগ্রসরমান ছিল নজরুলের চেতনা! এ উপন্যাসের নায়ক শ্রেণী সংগ্রামী, এ উপন্যাসের একজন নায়িকা নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র, অশিক্ষিত কিন্তু প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, অপর নায়িকা উচচ শ্রেণীর, শিক্ষিতা কিন্তু তথাকথিত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে ভালবাসার পাত্রকে যার অদেয় কিছুই নেই, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বিধবা যুবতী নারীদের মতো সে নীতির জন্যে নিজেকে ফাঁকি দেয়নি।

নজরুলের তৃতীয় ও শেষ উপন্যাসের নায়ক উল্‌ঝলুল্‌ বা জাহাঙ্গীর, কলিকাতা ...ল রাজপথ সকল অলিগলির ধূলা-কাদা পায়ে লেগেছে বলেই হতভাগ্য জাহাঙ্গীর আ...

উচ্ছৃঙ্খলুল্ নামের বিদ্রূপ-তিলক পরেছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য থেকে মানুষকে টেনে বের করার—বাঁচাবার দুরন্ত সাধনা তাকে পেয়ে বসেছে বলে, সত্যকে দর্পণের মত হাতে ধরে দেখতে চায় বলে সে রুচিবাগীশ নীতি-কচ্‌কচিদের ঘৃণার বক্র-ইঙ্গিত সয়ে যাচেছ্। উচ্ছৃঙ্খলুল্ বা জাহাঙ্গীর নজরুলের মতোই সত্যব্রত, বেদনা-সুন্দর, পাগল। কিন্তু বড় জমিদারের পুত্র হলেও তার মা তাকে ভয় করেন,

> বহুদিন হইতেই জাহাঙ্গীরের চোখে মুখে, চলাফেরায়, কঠিন জীবন যাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদনাক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তর মত ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতি-পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল,···
> জাহাঙ্গীর যখন জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপী গরীয়সী বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার! সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান।

বাংলা উপন্যাসে আমরা পূর্বে পতিতাদের নায়িকারূপে দেখেছি কিন্তু নজরুলই সম্ভবতঃ প্রথম কামজ বা জারজ সন্তানকে উপন্যাসের নায়কের সম্মান দিয়েছেন, এই নায়ক যেদিন থেকে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানতে পেরেছে সেদিন থেকে তার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলে গিয়েছে। তার জীবনের আনন্দ-দীপালিকে যেন থাবা মেরে নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করে বোঝবার সাধনা করছে। নিষ্ঠুর বজ্রলোকের সত্যের সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় হয়ে গেছে বলেই সে কঠোর বাস্তব-ব্রতী। ···জাহাঙ্গীর যখন স্কুলে পড়ে সেই স্বদেশীযুগে তখনই 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বিপ্লববাদী তরুণ স্কুল মাষ্টার প্রমত্ত।

জাহাঙ্গীর মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'মাতৃমন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়ায় বিপ্লবী নায়ক প্রমত্ত-কে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু প্রমত্ত মানতে পারেননি যে বাঙ্লার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারবেনা। প্রমত্তের যুক্তি—ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাঙ্লার জলবায়ু দিয়ে ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি, যে শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ হিন্দুদের মধ্যে আছে তা মুসলমানদের মধ্যেই বা থাক্‌বে না? ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা 'অহিংসা পরম ধর্ম' কে কখনো বড় করে দেখেনি এবং তাতে অগৌ-রবের কিছু নেই। মারকে মারখেয়েই জয় করার অহিংসবাদী মতবাদ সম্পর্কে প্রমত্তর যে মন্তব্য তা বস্তুতঃ নজরুলেরই কথা,

> তা'হলে আমরা বহুদিন হ'ল জয়ী হয়ে গেছি। কারণ আমরা নির্বিকারচিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, ···আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হুন মেরেছে, আরবী ঘোড়া মেরেছে চা'ট, কাবুলি ওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরাণী মেরেছে ছুরি, তুরাণী হেনেছে তল্‌ওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগীজ-ওলন্দাজ দিনেমার-ফরাসী ভাতে মার্‌তে এসে মেরেছে হাতে আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মার্‌তে বাকী ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু···তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজী।

ঐ ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রমত্তর প্রধান সাথী জাহাঙ্গীর কিন্তু সে পথেও তার দ্বিধা ছিল। যদিও জাহাঙ্গীরের জন্ম-বৃত্তান্ত জেনে প্রমত্ত তাকে বলেছিল 'কোন

অসহায় মানুষই ত তার জন্মের জন্য দায়ী নয়।' আর জাহাঙ্গীর তাকে বলেছিল, 'আমি তাহলে নিষ্পাপ ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমাকে কলুষিত করেনি ?…না প্রমত্তদা আমার প্রতি-রক্তকণা অপবিত্র—আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিল্‌বিল করে ফিরছে বিছের বাচচার মত।' প্রমত্ত উত্তর দিয়ে ছিল—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।" জাহাঙ্গীর বলেছিল, "জননী নয়, জননী নয়, শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী।" যাই হোক, জাহাঙ্গীর নিজেকে উৎসর্গ করেছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের সাধনায়, প্রমত্তর নির্দেশে অনেক বিপজ্জনক কাজ করেও শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়েছিল, হয়েছিল দ্বীপান্তর।

'কুহেলিকা' উপন্যাসেরও নায়িকা দু'জন একজন সাধারণ ঘরের মুসলমান তহ্‌মিনা বা ভূণী, জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুণের বোন। অপরজন হিন্দু, বিপ্লবী দলের চম্পা। ভূণীর বয়স পনের পার হয়ে গেছে, চমৎকার জ্বল্‌জ্বলে চোখ-মুখ, সমস্ত শরীরে প্রখর বুদ্ধির দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। ছুটীতে হারুণের সঙ্গে জাহাঙ্গীর তাদের গ্রামের বাড়ীতে গেলে অভাবিত ভাবে ভূণীর সঙ্গে জাহাঙ্গীর জড়িয়ে পড়ে। ভূণীর মাতা ছিলেন অপ্রকৃতস্থা,

> ভূণী যখন জাহাঙ্গীরকে সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে নামিয়া কন্যার হাত ধরিয়া জাহাঙ্গীরের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা উপরে আল্লা, নীচে তুমি। আমার তহ্‌মিনাকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। দেখো বাবা। ও যেন কষ্ট না পায়। ওই আমার মীনা আমার নয়নের মনি!" বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন।

জাহাঙ্গীর অবিলম্বে ভূণীদের বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলে ভূণী জাহাঙ্গীরের পায়ের নীচে বসে বলেছিল,

> …আপনি যেটাকে মিথ্যা বল্‌ছিলেন, আপনি বোধহয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই! আপনি বলবেন, মা আমার উন্মাদিনী। তবু তিনি আমার মা। আমরা নারী, আমরা হয়ত সকল কিছু অন্ধের মত বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাকলে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘটতনা। …আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার কাছে বড় সত্য আমার কাছে নেই।

জাহাঙ্গীর বিপ্লবী, সে জারজ সন্তান তাই তার দিক থেকে সম্ভব ছিলনা ভূণীকে গ্রহণ করার কিন্তু সে তাকে অস্বীকার করতে পারেনি, আর ভূণীর শর্ত ছিল যেদিন জাহাঙ্গীরের অভিভাবিকা জননী এসে ডাকবেন সে দিনই সে যাবে তার কাছে। জাহাঙ্গীরের জননী সব জানতে পেরে যে রাতে সদলবলে ভূণীদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল সে রাতেই ভূণীকে আত্মসমর্পণ করতে হল জাহাঙ্গীরের কাছে,

> সে ভূণীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। তহ্‌মিনা পুলকে আবেশে জাহাঙ্গীরের কোলে ঢলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর আজ দিশা হারাইল। …তহ্‌মিনা সুখে লজ্জায় উত্তেজনায় শিথিল-তনু শিথিলবসনা হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছিলনা।…
> দেব-কুমার এক মুহুর্তে রক্ত-লোলুপ পশু হইয়া উঠিল।

কোথা হইতে যেন কি ঘটিয়া গেল। তহ্‌মিনা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি এ কি করলে ?'...

'কুহেলিকা'র অপর নায়িকা চম্পা, বিপ্লবীদলের মাধ্যমে জাহাঙ্গীর তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, বিপ্লবীদের শক্তি-স্বরূপা জয়তী, যার মৃত বোনের পুত্র পিনাকপাণির ফাঁসী হয়েছিল। সেই জয়তী দেবীর কন্যা চম্পা যেন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ, যাকে দেখে সহসা জাহাঙ্গীরের ভূণীকে মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল এরা মায়াবিনীর জাত। এরা সকল কল্যাণের পথে মায়া-জাল পেতে রেখেছে।

জাহাঙ্গীর পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সহ চম্পাকে নিয়ে ট্রেনে বর্ধমান থেকে রাণীগঞ্জ যাবার সময় নিজের সব কথা তাকে খুলে বলেছিল, 'ভূণীকে বিয়ে করব কিনা জানিনে চম্পা, কিন্তু তার সর্বনাশের আর কিছু বাকী রাখিনি।' 'তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তাকে বিয়ে করা। কিন্তু সে ত জানেনা--আমি আমার পিতার কামজ সন্তান,—আমার মা ছিলেন বাইজি। একথা জানলে সে কি আর আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে ? আমার মূলে যদি পাঁক না থাকত, তা'হলে আমি কি অত বড় পাপ করতে পারতাম ?' জাহাঙ্গীরের সব কথা শুনে চম্পা ঘৃণায় সরে যায়নি, তাকে স্নেহের সাথেই বলেছিল, 'তুমি ত রক্ত-মাংসেরই মানুষ। ভুল বড় বড় মহাপুরুষও করেন। যাঁদের জন্যে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করেনি, তাঁরাও তো সারা জীবন পাপে ডুবে রয়েছেন দেখছি। তোমাদের অগ্নিপন্থী দলেরই নামকরা দু'চার জনকে জানি যারা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল।" ও কথায় জাহাঙ্গীর চম্পাকে তার কাছে আকর্ষণ করে বলেছিল, 'চম্পা, আমায় বাঁচাও। হয় আমায় একেবারে রসাতলে—যে পাঁক থেকে উঠেছি সেই পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নয় আমায় ঊর্ধ্বে নিয়ে চল হাত ধরে।' উত্তরে জাহাঙ্গীরকে চম্পা বলেছিল, 'তোমায় বাধা দেবনা। জানি আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল। "আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি, কাল করতে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার ত আর কোনো অবলম্বন নাই। আমিও ত রক্ত মাংসের মানুষ—আর তোমাদেরই মত পশুত্ব দিয়ে পশুত্বকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই।...জাত ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে। কিন্তু আমার নারী ধর্ম ত আছে। তাকে আজ যদি বিসর্জন দিই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—যেমন করে ভূণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমাকে দেখেই হয়তো আমার ভালো লেগেছিল। তরুণ অরুণের মত যেদিন তুমি এসে আমাদের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলে তোমার প্রখর দীপ্তি নিয়ে---সেইদিন থেকে তোমায় সকল প্রাণ-মন দিয়ে শ্রদ্ধা করে আসছি, মরণোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—তবে ঐটুকুর বিনিময়ে আমার অমন অমূল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিওনা।' যে জাহাঙ্গীর জীবনে ভাবেনি নারী জাতিকে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারবে—তাদের ভালবাসতে পারবে--তাদের প্রেমে বিশ্বাস করবে—সেদিন চম্পার কথায় সে তার শ্রদ্ধা ভালবাসা বিশ্বাস ফিরে পেল। তার কাছে পাপে পৃথিবীও সুন্দর হয়ে উঠল, মরুভূমির ঊর্ধ্বে মেঘের স্বপ্ন ভেসে উঠল। চম্পা জাহাঙ্গীরের চিরদগ্ধ বুককে শীতল করল।

বস্তুতঃ 'কুহেলিকা' উপন্যাস বাহ্যতঃ বিপ্লবীদের কাহিনী হলেও এর গভীরে রয়েছে নর-নারীর আদিম প্রবৃত্তিগুলোর পর্যালোচনা, যে প্রবৃত্তিগুলো কুহেলিকাময় আর তার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছেন নজরুল এই উপন্যাসে।

নজরুলের প্রতিটি গল্পে ও উপন্যাসের নায়কের মধ্যে নজরুল প্রতিফলিত, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'রিক্তের বেদন', 'ঘুমের ঘোর' এর যুদ্ধে যাওয়া নায়কেরা, 'বাঁধনহারা'

পত্রোপন্যাসের নুরু, 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা' উপন্যাসের আনসার এবং জাহাঙ্গীর চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন বয়স ও অভিজ্ঞতার নজরুল ধরা পড়েছে। নজরুল তার গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের আদর্শায়িত করেননি, তাদের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করেননি। নজরুলের কথাসাহিত্যে নায়ক-নায়িকারা সকলেই রক্ত-মাংসের মানুষ। দেশ-কাল বা সমাজ-সংসার নিরপেক্ষ নয় তারা, কাজে কাজেই তাদের মধ্যে পটভূমিকাজনিত প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। কিন্তু নজরুলের নায়ক-নায়িকারা সবাই প্রেমিক, তারা শেষ পর্যন্ত কেউ জীবনের দাবীকে অস্বীকার করতে পারেনি। রক্ত-মাংসের ক্ষুধা তারা মিটিয়েছে এমনকি জীবনের বিনিময়ে হলেও। নজরুলের মতো তার নায়ক নায়িকারাও সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দাবীও মিটিয়েছে।